স্মৃতিতে জ্বলজ্বল ৬ ডিসেম্বর

অফিসের কাজের ব্যস্ততায় জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় একটি দিন প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। রাত সাড়ে দশটায় বাসায় ফিরে টিভিতে সংবাদ দেখে অনেকটা সম্বিত ফিরে পেয়ে ফিরে গেলাম ৩৮ বছর আগে। ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। কি এমন ঘটনা যা আমার মনকে এখনো নাড়া দেয়?

একাত্তরের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম বঙ্গের হাসনাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে সুন্দরবন, মঠবাড়িয়া, কাউখালী, ঝালকাঠি, বানারিপাড়া হয়ে ঐ মাসের মাঝামাঝি সময়ে চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল বরিশালের গৌরনদী থানার মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছানো। দলে ১১০ জন। অর্ধেকেরও বেশি আমার সমবয়সী। উল্লেখ্য, ঐ বছর আমার এসএসসি পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। আমাদের প্রায় পুরোটা ভ্রমন বিস্ময়কর, উত্তেজনা ও ঝুঁকিপূর্ণ। পথে একাধিকবার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের মুখোমুখি হয়ে কখনওবা তাদেরকে পরাজিত করে, আবার কখনওবা কৌশলে এড়িয়ে এই দীর্ঘ পথপক্রিমা সত্ত্বেও আমরা মোটেও পরিশ্রান্ত ছিলাম না। সে ভ্রমণ ও পথযুদ্ধের কাহিনী বিবৃত করতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখতে হবে। তা নিয়ে কর্মজীবন শেষে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা আছে। তাই ওসব প্রসঙ্গে না গিয়ে আজ শুধু স্মৃতিমাখা ৬ ডিসেম্বর নিয়ে লিখছি।

আমাদের অবস্থান গৌরনদী থানায়। আমরা গৌরনদী কলেজে আটকে পড়া পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের সহযোগীদেরকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছি। রয়ে রয়ে দু' পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হচ্ছে। আমরা পুরোদমে শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি ওদেরকে ধরে ফেলবার। ৪ ডিসেম্বর হঠাৎ আমাদের কমান্ডার নিজাম উদ্দিন বললেন, তোমরা বাড়ি যাও, সাত দিনের বিশ্রাম নিয়ে আসো। কারণ এরপর যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোন ছুটি পাবে না। এ আরেক বিপদ, বাড়ি যাবো কোথায়, কার কাছে? কারণ বলছি।

আমার জম্মস্থান রাজাপুর। এর অর্ধেক অংশ তৎকালীন ফরিদপুরের কোটালীপাড়া থানায়, আর অর্ধেক বরিশালের গৌরনদীতে। আমাদের গ্রাম থেকে শুরু করে উত্তর দিকে গ্রামের পর গ্রাম মুক্তিযুদ্ধ চলাকলীন পুরো নয় মাস মুক্তাঞ্চল ছিল। তবে মাঝেমধ্যেই পাকিস্তানী বাহিনী বিপুল সমরাস্ত্র নিয়ে এসব অঞ্চলে হানা চালাতো। এমনই এক দিন ছিল ১৭ জুন ১৯৭১। সেদিন ঘুম ভাঙ্গে পাকিস্তানীদের গুলির শব্দে। ওরা আমাদের গ্রামে হামলা চালিয়েছে। কারণ আগের রাতে দুর্ধর্ষ দুই মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত ও কমলেশ কোটালীপাড়া থেকে ২০-২৫ জনের একদল রাজাকার ধরে এনে এখানে তাদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করে। এরই প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানীদের এ হামলা। হেমায়েত ও কমলেশের মূল ক্যাম্প ছিল আমাদের গ্রামে। তারাও প্রস্তুত ছিল। পাল্টা হামলা চালায়। টানা দু' ঘন্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানীরা পিছু হটে যায়। কিন্তু আমরা খবর পেতে থাকি প্যাকস্তানীরা বরিশাল ও গোপালগঞ্জ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের গ্রামে যে কোন সময় হামলা চালাবে। তাই ঐ দিনই গ্রাম প্রায় শূন্য হয়ে যায়। অন্যদের সাথে আমাদের পরিবারেরও অনেক কষ্টক্লেশ শেষে জুনের শেষ নাগাদ কলকাতার উপকণ্ঠে লবনহ্রদ স্মরণার্থী শিবিরে ঠাই মেলে। কিন্তু সবে কৈশোর পেড়িয়ে যৌবনে পা দেয়া মন টানে বারবার যুদ্ধের ময়দানে। সুযোগ পাবো কেমন করে? শুনেছি এই বয়সের ছেলেদের জন্য ট্রেনিং না হলে যুদ্ধে যাওয়া যাবে না। জানতে পারলাম যুবকদেরকে ট্রেনিং-এ নিয়ে যাবার জন্য মাঝে মাঝেই লবনহ্রদে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রাক আসে। পরিবারের সকলের অগোচরে এই সুযোগ নিলাম একদিন আমি আর আমার বন্ধু উপেন। সম্ভবত সেটি ছিল আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহের কোন এক দিন। লবনহ্রদ থেকে কলকাতার শিয়ালদা স্টেশন সেনা ক্যাম্পে। সেখান থেকে সারা রাত ট্রেনে করে বাংলা-বিহারের সীমান্ত শহর রামপুরহাট ট্রেনিং ক্যাম্প। এরপর ছয় সপ্তাহ ট্রেনিং শেষে দেখা করার ছুটি মেলে পরিবারের সাথে। অক্টোবরের শেষ দিকে লবনহ্রদে ফিরে এসে মাকে যখন বলি দেশে যাবো যুদ্ধ করতে সে আর পিছ ছাড়ে না। এ আর এক মহাবিপদ। মাকে অনেক কষ্টে বোঝাতে সক্ষম হলাম দেশে গিয়ে বাড়ি ওঠবো। ঘরদোর পয়পরিস্কার করে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাখবো যেন যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে বসবাসের কোন সমস্যা না হয়। কারণ বাড়িতে কেউ না থাকার কারণে ওটাতো এখন সাপ-শেয়াল জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। অবশেষে মায়ের অনুমতি মেলে। তাই বলেছি, গৌরনদী থেকে বাড়ি যাবো কার কাছে? উঠবো কোথায়? কেউ যে নেই ওখানে।

কিন্তু কমান্ডারের নির্দেশতো অমান্য করা যাবে না। তাই বাড়ি গেলাম বটে, তবে তা নিজেদের বাড়ি নয়, পাশের গ্রামের বন্ধুদের বাড়ি। কিছুটা বিসন্নতা থাকলেও সময় কেটে যাচ্ছিল ভালোই। ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিন সহযোদ্ধা বন্ধু খালেক, জগদীশ ও আমি গোপালগঞ্জ ও বরিশালের সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলে একটা লোহার পুলের উপর আকাশবাণীর খবর শোনার জন্য রেডিও ধরে বসে আছি। খবরে শুনলাম বিশ্বের মধ্যে ভূটান প্রথম দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা আনন্দে মেতে ওঠলাম। কিন্তু আরো অধিক কিছু শোনার জন্য মন আনচান করছিল। এমন সময় ঘোষণা এলো এখন লোকসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। আমরা চুপ হয়ে রেডিওতে কান পেতে রইলাম। এ যেন স্বর্গলোক থেকে দেবি মহামায়া অমোঘ বাণী শোনাচ্ছেন। সেসবের অনেক কিছুই আজ আর মনে নেই, যদিও এটি ঐতিহাসিক ও কালজয়ী ভাষণ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তবে এ ভাষণের দু'টি বিষয় এখনো আমার স্মৃতিতে আম্লান হয়ে আছে, তা হচ্ছে- (১) এ ভাষণের মাধ্যমেই ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং (২) তিনি হিন্দিতে যা বলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে "আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে এনে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিতে চাই ভারত কী পারে"।

তিন বন্ধু উত্তেজনায় কোন রকমে সারা রাত কাটালাম, কখন ভোর হবে, আমরা ক্যাম্পে যাবো, যুদ্ধ করবো, দেশকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত করবো। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করার বিশ্ব জানান দিয়েছেন। এখন শুধু চূড়ান্তভাবে বিজয় কেতন ওড়াবার অপেক্ষা। তাই ৬ ডিসেম্বর আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল চির ভাস্বর একটি দিন।

বীরেন অধিকারী

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ২০০৯